OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 108
Website: https://tirj.org.in, Page No. 959 - 970
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 959 - 970
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা গান : আধুনিকতা এবং তারপর

ড. সায়ক মুখার্জি
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : sayakmukherjee@tripurauniv.ac.in

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Bengali song, History, Modernity, Globalization, Post-Modern, Time.

Abstract
One of the most well-liked musical genres in India is Bengali music. Since the dawn of civilization, music has played a significant role in human existence. Since ancient times, Bengali songs have been an integral part of Bengali culture. The song made reference to modernity in the later 19th century. The protagonist is Rabindranath Tagore. Bengali songs have been influenced by the significant changes that have occurred both domestically and internationally, as well as the ways that historical and political events have impacted people's lives. Later, this song has transcended the current era and given rise to new commentary in the hands of different lyricists. The song's lyrics evolved together with the crisis of civil life. It changed again because of globalization.
This fundamental study looks at how Bangla songs have evolved over time, h ow it represents modernity, and how they move from the mordenityto the post -modern era.

Discussion

বাঙালির শিল্পচর্চার অনন্য ফসল বাংলা গান। কয়েক শতকের পথ পেরিয়ে আজ আধুনিক বাংলা গান যেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে, সেই পটভূমিতে আমাদের অনুসন্ধান করা দরকার এর আধুনিকতার অগ্রযাত্রার ইতিহাস। কেননা আজকের এই দ্রুত পরিবর্তমান সময়ে বাংলা গানের রূপ আর সমস্ত শিল্পের মতোই দ্রুত বদলে যাচ্ছে। আধুনিকতার নান্দনিক মূল্যবোধ বাংলা গানকে যেভাবে সাজিয়েছে, বর্তমানে সেই মূল্যবোধই নানান প্রশ্নের সম্মুখীন, তাই আমাদের ভাবা দরকার সেদিনের বাংলা গান কীভাবে যথার্থ অর্থেই হয়ে উঠেছিল আধুনিক। আর কেমনভাবেই তা ধারণ করেছিল সময় সময়কে।

আধুনিকতা বলতে আমরা উদারনৈতিক, মানববাদী, যুক্তিবাদ যে ধারণার কেন্দ্রে অবস্থিত সেই ভাবনাকেই বুঝতে চাইছি। এবং আমরা এই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতেই আধুনিকতার বৈশিষ্ট্যগুলিকে গ্রহণ করে বাংলা আধুনিক গানের পথ চলার ইতিহাসকে একটু উল্টে-পাল্টে দেখব। উনিশ শতকের শেষাশেষি মূলত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)-এর হাত ধরেই বাংলা গানে লক্ষণীয় পরিবর্তনের সূচনা। মধ্যযুগের সংগীতের ধারায় লক্ষণীয় পরিবর্তনের অনুরণন শোনা যেতে শুরু করে উনিশ শতকের শুরু থেকেই। সে পরিবর্তনের কান্ডারী অবশ্যই নিধুবাবু—রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৯)। তারপর কালী মীর্জা (১৭৫০-১৮২০), শ্রীধর কথক (১৮১৬-?)-এর হাত ধরে বাংলা গান নানান পথ অলিগলি অতিক্রম করে উনিশ শতকের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 108
Website: https://tirj.org.in, Page No. 959 - 970
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নাগরিক সংস্কৃতির সঙ্গে মানানসই হয়ে নতুন রূপ নিল। অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ যার রূপকার। সংগীত নিয়ে যখন থেকে ভাবনা শুরু, সে সময়েই রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন তাঁর চারিপাশের বাংলা গানের যে চরিত্র তার মধ্যে যেমন নেই রুচি, নেই নান্দনিকতা, তেমনই নেই সমসময়। তিনি বুঝেছিলেন যে গান হবে সময়ের সাক্ষী, যেখানে থাকবে আধুনিক হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ, সে গান সৃষ্টি করতে হবে তাঁকেই। তাই দেখি বাংলা গান রবীন্দ্রনাথের হাতে এক বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করে। কথা ও সুরের অনুপম সম্মিলনে সে গান বাঙালি হৃদয়ে তো বটেই, স্থান করে নেয় যেকোনও সংগীত রসিকের মননে। রবীন্দ্র সংগীত বাংলা গানের রাজপথ নির্মাণ করেছে এবং যেন উৎসমুখ খুলে দিয়েছে এক নির্ঝরিণীর। মূলত রবীন্দ্রনাথের কাব্য ভাষাকেই সঙ্গী করে পরবর্তী গীতিকারেরা এলেন বিশ শতকের শুরুতেই— দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০), অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪)। তাঁদের প্রভাবিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। শুধু গান রচনা নয়, তাতে সুর আরোপ করে তা পরিবেশনের মধ্যে দিয়েই বাংলা গান সমকালীন হয়ে উঠল এঁদের হাত ধরেই। তাতে কখনও কখনও ব্যক্তিগত প্রাণের প্রকাশ, কখনও বা ঈশ্বরের চরণে ভক্তিপূর্ণ প্রণতি, কখনও হাসি-হল্লা, রঙ্গ-রসিকতা, আর কখনও বিশ শতকের সময়ের স্বাক্ষর রূপে ধরা দিল দেশাত্মবোধ। জাতি গঠনের সেই সূচনালগ্নে বাংলা গান দেশপ্রেমের চারণভূমি হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রবলয় থেকে বেরিয়ে বাংলা গানকে সম্পূর্ণ নতুন পথ যিনি দেখালেন, তিনি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। কাজী নজরুল ইসলামকে কেন্দ্র করে বাংলা গানের নতুন জোয়ার এল। শুধু সুরের বৈচিত্রই নয়, তাঁর গানের কথায় তিনি নিয়ে এলেন নতুন শব্দবন্ধের ব্যবহার। পাশ্চাত্য, মধ্যপ্রাচ্য কিংবা বাংলা লোকজীবন থেকে সুর সংগ্রহ করে অথবা রাগ-রাগিনির সুরে যে নতুন গানের কাঠামো তিনি নির্মাণ করলেন, তাতে জুড়ে দিলেন সমকালীন জনরুচির সঙ্গে মানানসই ভাষা। আর তাই নজরুল ইসলামকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হল আরেকটি সংগীত বলয়। এলেন এক ঝাঁক গীতিকার যাঁদের রচনায় সরাসরি নজরুলের প্রভাব খুব স্পষ্ট। সুবোধ পুরকায়স্থ (১৯০৭-১৯৮৪), প্রণব রায় (১৯১১-১৯৭৫), মোহিনী চৌধুরী (১৯২০-১৯৮৭), শ্যামল গুপ্ত (১৯২২-২০১০) প্রমুখ এই সময়ের গীতিকারদের অন্যতম। তাঁদের গানের কেন্দ্রীয় বিষয় হল, ব্যক্তির হৃদয় আবেগ। প্রেম-বিরহের দোলায় দোলায়িত যে জীবন তাকেই তাঁরা ভাষা দিলেন তাঁদের গানে। কিন্তু সমকাল আরও বেশি কিছু দাবি করছিল। কেননা, ততদিনে রাজনৈতিক পরিস্থিতির এক লক্ষণীয় বদল ঘটেছে। বিশ শতকের ত্রিশের দশকের ঘটনাপ্রবাহ অনুসরণ করলে আমরা দেখি, স্বৈরাচার এই দশকে তার চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ক্রমশ গ্রাস করতে চেয়েছে অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশগুলিকে। আবার এর পাশাপাশি মানুষের প্রতিবাদ, অপসহীন লড়াইয়ের সাক্ষী থেকেছে এই দশক। চল্লিশের দশকের শুরু থেকেই এই পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে উঠেছে। '৪২-এর 'ভারতছাড়ো আন্দোলন', '৪৩-এর দুর্ভিক্ষ কিংবা আই. এন. এ-র সেনাদের বিচারকে কেন্দ্র করে ছাত্র-জনতা আন্দোলন, ডাক ও তার বিভাগের ধর্মঘট এবং ১৯৪৭ সালের দেশভাগ— সব মিলিয়ে এই দশক ঘটনার ঘনঘটায় আর মানুষের প্রতিবাদে উত্তাল। কিন্তু বাংলা গান এই সময়ের কথা তেমনভাবে মূর্ত করতে পারছিল না। যদিও বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি উদাহরণ আমাদের সামনে রয়েছে। আমাদের মনে পড়ে যায় মোহিনী চৌধুরীর লেখা এই গানটি, -

"পৃথিবী আমারে চায়, রেখো না বেঁধে আমায়,
খুলে দাও প্রিয়া, খুলে দাও বাহুডোর।
...সবার মনের দীপালী জ্বালাতে যে দীপ আপনি জ্বলে,
কেন আর তারে ঢেকে রাখ বলো তোমার আঁচল তলে।
শোন না কি ওই আজ দিকে দিকে হায়,
কত বঁধু কাঁদে, কাঁদে কত অসহায়,
পথ ছেড়ে দাও, নয় সাথে চলো, মুছে নাও আঁখিরোল,
খুলে দাও প্রিয়া, খুলে দাও বাহুডোর।"[১]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 108
Website: https://tirj.org.in, Page No. 959 - 970
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এমন আর্তি বাংলা গানে ইতস্তত শোনা গেলেও, মূল ধারায় তখনও একাধিপত্য করছে প্রেম। চাঁদ-ফুল-জোছনার গান তখনও বাংলা গানের জগত ঘিরে রেখেছে। নজরুল ইসলামের হাতেই যার বিস্তার। কিন্তু তাঁর কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি গানের ভিন্নতর আরেকটি দিক— দেশাত্মবোধক বাংলা গান। যদিও রবীন্দ্রনাথের কাছেও আমরা দেশপ্রেমের গান পেয়েছি, তবু নজরুলের গানগুলি বিশ শতকের লড়াকু জনতার মনোভাবকে এক ভিন্নতর ভাষা দিয়েছিল। এবং এ কথাও নির্দ্বিধায় বলা যায়, পরবর্তীকালে মানুষের আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে যে গণসংগীত গড়ে উঠেছিল, কাজী নজরুলের দেশাত্মবোধক গানে তার প্রাক-প্রস্তুতির রূপটি আমরা পেয়ে যাই। তবু ত্রিশ-চল্লিশের দশকের ব্যাপক অংশের শ্রোতার কাছে যে আধুনিক বাংলা গান পরিবেশিত হচ্ছিল, রেডিও কিংবা রেকর্ডের মাধ্যমে তা মোটামুটি একটা নির্দিষ্ট ধরনকে অনুসরণ করেই চলেছিল যেখানে ছিল প্রেম-বিরহ-মৃত্যু নিয়ে নির্মিত কল্পলোক, মানব জীবনের একটা বিরাট অংশকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শুধুমাত্র কান্না-হাসির মধুর বাসর রচনার কল্পনা, এমনকী মৃত্যুর পরেও প্রেমের মধ্যে দিয়ে প্রিয় মিলনের বাসনাও শোনা গেছে।

ত্রিশ-চল্লিশের বাংলা গানের গতানুগতিক এই ধারায় উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম সলিল চৌধুরী (১৯২৫-১৯৯৫), যাঁর হাতে বাংলা গানের নব নির্মাণ হল। সুরেও যেমন, কথাতেও তেমনই। তাঁর আগমন বাংলা গানের জগতে এক বিস্ময়কর ঘটনা। শুধু বিস্ময়কর নয়, যাঁর প্রচেষ্টায় বাংলা গান আধুনিকতার সীমাকে অতিক্রম করে আরও নতুনতর এক পর্বে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তিনি সলিল চৌধুরী। আধুনিকতার যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য বাংলা গানের কথায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে মূলত রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় করে তার ব্যাপ্তি আমরা পাই তাঁর বাণীতে। শুধু কথায় নয়, সুরের এক ইন্দ্রজাল যেন সলিলের সমগ্র সাংগীতিক প্রয়াসকে এক অন্য মহিমা দিয়েছে। তাঁর সাংগীতিক জীবনের শুরু থেকেই তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেশার সুযোগ পেয়েছেন, সুযোগ পেয়েছেন বিভিন্ন ধরনের দেশি-বিদেশি সুর শোনার আর সমৃদ্ধ হয়েছেন নানান গুণী মানুষের সঙ্গ করে। সব মিলিয়ে তাঁর সাংগীতিক যাত্রা জনতার প্রতিদিনকার জীবন থেকে শুরু হয়ে তাদেরই হাত ধরে পৌঁছে গেছে তাদের দৈনন্দিন লড়াইয়ের ভূমিতে। গণনাট্য সংঘের সঙ্গে সলিল চৌধুরীর যোগাযোগ তাঁর যৌবনে। স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের সহযোগিতায় তিনি গান লেখা শুরু করেন এবং গণনাট্য সংঘের সঙ্গে পরিচিত হন। এক্ষেত্রে নিত্যানন্দ চৌধুরী বা খেপুদার কথা বলেছেন তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে যাঁর বিশেষ যত্নে একটি একটি করে লড়াই আন্দোলনকে দেখেছেন খুব কাছ থেকে এবং সে প্রসঙ্গে গান রচনার অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। বিদ্যাধরী নদীর বন্যায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার একটা বিরাট অংশের মানুষের দুঃসহ যন্ত্রণা এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখরিত হয় তাঁর লেখার এই গণসংগীতটিতে, -

“দেশ ভেসেছে বানের জলে ধান গিয়েছে মরে
কেমনে বলিব বন্ধু প্রাণের কথা তোরে।
ঘরেতে চাউল নাই পরনে পিরান নাই
অনাহারে দিবানিশি ভাসি নয়ন লোরে॥
দেশ ভেসেছে বিশ বছরের ধোঁকাবাজির ঘোরে
(আর) কাজের নামে শোষণকারী লোটে কু-কাজ ক'রে।
(তাই) নদীতে বাঁধন নাই, থেকেও না কাজ পাই
বিধির বিধান নয়কো এ ভাই বুঝবে কবে ওরে
কেমনে বলিব বন্ধু প্রাণের কথা তোরে॥
মানব না এ বিধান মানব না
অবহেলা অপমান সইব না
তোমাদের যতকিছু মারণ কাঠির ফল
ভুলব না কিছুতেই ভুলব না।

বাঁচবোই বন্ধু একহাতে বাঁচব
দেশজোড়া ভাই বোন কন্যা
শোষকের সৃষ্টি-এ বন্যা।
কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাতিয়ার শানিয়ে
আনব নতুন দিন বাজবে প্রাণের বীণ
মিলিত মিছিলে হবে ধন্যা॥''[২]

গণনাট্য সংঘ এমন অনেক শিল্পী সাহিত্যিককে নিয়ে এসেছে মানুষের লড়াইয়ের পাশে, যাঁরা পরবর্তীকালে তাঁদের সারা জীবনের সেই সূচনাকে স্মরণ করেছেন। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র (১৯১১-১৯৭৭), নিবারণ পণ্ডিত (১৯১২-১৯৮৪), হেমাঙ্গ বিশ্বাস (১৯১২-১৯৮৭), গুরুদাস পাল (১৯১৩-১৯৬৮), বিনয় রায় (১৯১৮-১৯৭৫), এবং অবশ্যই সলিল চৌধুরী। এই গণনাট্য সংঘের আদর্শ বা নীতি নির্ধারণকারি শক্তি ছিলেন বামপন্থীরা এ কথা ঠিক। কিন্তু শিল্পীদের যাঁরা অনুভূতি প্রবণ যাঁরা সমাজ সচেতন তাঁদের অনেকেই কিন্তু শেষ পর্যন্তই কিন্তু গণনাট্য সংঘের নিয়ন্ত্রণে থেকে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শকে প্রচারের জন্যই শিল্প করতে রাজি ছিলেন না। শুধু নির্দিষ্ট মতাদর্শের প্রচার নয়, তাঁদের আপত্তি ছিল নির্দিষ্ট ধরন এবং নির্দেশিকার বিরুদ্ধেও। এবং ঠিক সেই কারণে সলিল চৌধুরী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, ঋত্বিক ঘটক (১৯২৫-১৯৭৬) এঁরা প্রত্যেকেই গণনাট্য সংঘের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন। কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ আমরা বলছিলাম বাংলা গানের আধুনিকতার প্রসঙ্গে। এই গণনাট্য সংঘের গানগুলির দিকে যদি আমরা লক্ষ করি তাহলে দেখব সেখানে মানুষের লড়াই আন্দোলন জয়-পরাজয় এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রাত্যহিকতাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সেদিক থেকে বাংলা গানের যে ধারাটি চলছিল অর্থাৎ চাঁদ, চামেলী আর ফুল, তারার কাব্যের থেকে বেরিয়ে এসে মানুষের লড়াই হয়ে উঠল গানের বিষয়। তবু এও আধুনিকতারই আরেকটি দিক, যেখানে মনে করা হয় একটি আদর্শ বা একটি নৈতিক মতবাদ আমাদের পৌঁছে দেবে বিজয়ের লক্ষ্যে বা আমাদের এগিয়ে দেবে প্রগতির পথে। ত্রিশ এবং চল্লিশের দশক গণসংগীতের মূর্ছনার কাল। যদিও রেডিও-টিভির অনুকূল্য পায়নি গণসংগীত। তবুও লড়াকু মানুষের মুখে মুখে সে গান ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের স্মরণে থাকবে ডাক ও তার বিভাগের ধর্মঘট ১৯৪৬-কে কেন্দ্র করে সলিল চৌধুরীর সেই ইতিহাস হয়ে যাওয়া গান 'ঢেউ উঠছে কারা টুটছে' কিংবা রংপুরের ছাত্র সম্মেলনের সময় তাঁরই লেখা 'বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা, আজ জেগেছে এই জনতা'। দাঙ্গার বিরুদ্ধে সলিল চৌধুরীর কলম ডাক দিয়েছে সাধারণ হিন্দু মুসলমানকে 'ও আয়রে ও আয়রে, ও ভাইরে ও ভাইরে'। আবার তেভাগা আন্দোলনে তাঁর সহকর্মী বিনয় রায়ের গান 'অহল্যা মা' যেমন মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল, তেমনই এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সলিলের লেখা গান 'হেই সামালো' গান আজও শ্রোতার মনকে উদ্দীপ্ত করে।

দাঙ্গা-দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর পেরিয়ে ১৯৪৭-এ সালে স্বাধীনতা নিয়ে এলো দেশভাগ। দু-টুকরো হয়ে গেল ভারতবর্ষ। জন্ম নিল এক নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির। লক্ষ লক্ষ মানুষের দেশান্তর আর নেতাদের চরম অপদার্থতা পরিস্থিতিকে আরো দুর্বহ করে তুলল। বাংলা গানের ভাষাতে তার ছাপ একেবারে যে নেই তা নয়। বরং বাঙালির গানে এ ঘটনার গভীরতর প্রভাব রয়েছে। কিন্তু এই সময় থেকেই আধুনিক সভ্যতার প্রতি যে আস্থা, তা ক্ষুন্ন হচ্ছিল সচেতন শিক্ষিত এবং চিন্তাশীল মানুষদের মধ্যে। যে কারণে পঞ্চাশের দশকে নাগরিক বিষণ্ণতার ছবি পাই আমরা বেশ কিছু গানে। বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগের মতো বড়ো বড়ো ঘটনা মানুষের ভেতর থেকে সভ্যতার প্রতি আস্থার ভিত যেন নাড়িয়ে দিচ্ছিল। নাগরিক প্রগতির মোহে মানুষের অনাস্থা এ সময়ে প্রতীয়মান হয় অমিয় দাশগুপ্তের লেখা এই গানটিতে, -

''নগর জীবন ছবির মত হয়তো
তবু, ভাবলেই চোখে বন্যা আসে নেমে,
এখানে হৃদয় বাঁধবে না কেউ শকুন্তলার প্রেমে।।''[৩]

বিলাসব্যসন আর পরিপূর্ণতায় ভরা যে জীবন সেখানে তখন হানা দিচ্ছে দুঃসময়, লক্ষ লক্ষ দুর্ভিক্ষপীড়িত উদ্বাস্তু জনগণের হাহাকার। নগরের পথে পথে তখন 'ফ্যান দাও' ফ্যান দাও' চিৎকার। সেখানে প্রেম তো বিলাসিতা। এ সময়ের গীতিকারদের লেখণিতে পাই সেই বিপন্নতার চিত্র। তাই রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণকলি, সলিল চৌধুরীর কাছে ধরা দেয় নতুন রূপে। যে কৃষ্ণকলির কালো হরিণ চোখ কবিকে মুগ্ধ করেছিল, তাকেই পঞ্চাশের দশকে সলিল চৌধুরী দেখলেন ময়নাপাড়ার দুর্ভিক্ষ পীড়িত একটি মেয়ে হিসেবে।

"হয়তো তারে দেখেনি কেউ
কিম্বা দেখে ছিল,
ছিন্নশত আঁচল ঢেকে জীর্ণ দেহখানি
ক্লান্ত পায়ে পায়ে যেতে পথে
কি জানি কি ঝড়ে,
গেছে বুঝি ঝরে
জীবনের তরু থেকে—
...সেই মেয়ে।
দুটি শীর্ণ বাহু তুলে,
ওসে ক্ষুধায় জ্বলে জ্বলে;
অন্ন মেগে মেগে ফেরে প্রাসাদ পানে চেয়ে।
কে জানে হায় কোথায় বা ঘর
কি নাম কালো মেয়ের।"[৪]

বর্ষা বাঙালির বড়ো প্রিয়। কত গান, কত কবিতার অবিরাম সৃষ্টি হয়েছে এই ঋতুকে ঘিরে। কিন্তু জীর্ণ পথবাসী মানুষের জীবনে সেই বর্ষাই দেখা দেয় বিভীষিকা রূপে। অরুণ বসু (১৯৩৩-২০১৬), ভাস্কর বসু ছদ্মনামে যিনি বেশ কিছু স্মরণীয় বাংলা গান লিখেছেন, তাঁর একটি গানে দেখছি বর্ষার এক অন্যরূপ —

"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান,
সেই বানের জলে ভাসলো পুকুর ভাসলো গোলার ধান।।
আকাশ ভেঙে নামল ধারা বর্ষা সর্বনাশা,
ভেসে গেল মাঝ দরিয়ায় আমার ভাঙা বাসা।
ফসল বোনা জমি গেল চাষার গেল ধান
হায় আগুন-নেভা উনুনে দিন হবে কি গুজরান?"[৫]

আধুনিকতার অন্যতম অবদান ব্যক্তির পরিবর্তে সমষ্টিগত প্রগতির ধারণা। সেই সমষ্টির চেতনাই মূর্ত হয়েছে গণসংগীতে কিংবা দেশাত্মবোধক গানে বা আধুনিক বাংলা গানের একটা বিরাট পর্যায়ে জুড়ে। কিন্তু পঞ্চাশের দশকের পরবর্তী সময় থেকে সমষ্টির পরিবর্তে ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ বাংলা গানের কথায় আরও স্পষ্ট হতে শুরু করে। যা সমষ্টির কাছে সত্য, তা ব্যক্তির সংকটকে তেমনভাবে প্রতীয়মান করছে না। বিপন্নতা বাড়ছে। পঞ্চাশের কবিদের কবিতায় সেই বিপন্নতার ছবি জীবনানন্দ যেমন বলেন, -

"সকল লোকের মাঝে ব'সে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা?
আমার চোখেই শুধু ধাঁধা?
আমার পথেই শুধু বাধা?"[৬]

তখন বাংলা কবিতায় শুরু হয়ে গেছে নতুন যুগ। সেই সময় কবিতার রাজপথ শাসন করতেন যাঁরা, অর্থাৎ শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৯৫), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২) — এঁরা খুঁজছেন কাব্য ভাষা। খুঁজে দেখছেন নতুন কিছু বলা যায় কিনা, কীভাবে বলা যায়। তাঁদের উপরে প্রভাব ফেলছেন পল রোবসন (১৮৯৮-১৯৭৬), হ্যারি বেলাফন্টে (১৯২৭-২০২৩) এবং অবশ্যই অ্যালেন গিন্সবার্গ (১৯২৬-১৯৯৭)। আধুনিক কবিরা যত তাড়াতাড়ি নিজেদের ভাষাকে খুঁজে পেতে শুরু করলেন তত তাড়াতাড়ি আধুনিক বাংলা গান নিজের ভাষাকে ধরতে পারেনি। তার জন্য আমাদের আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। যদিও পঞ্চাশের দশক থেকেই তার একটা সূত্রপাত আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম। এই সময়ের অন্যতম গীতিকার ও সুরকার সুধীন দাশগুপ্ত (১৯২৯-১৯৮২)-এর বেশ কিছু গান নিশ্চয়ই শ্রোতাদের স্মৃতিতে রয়েছে। শ্যামল মিত্র (১৯২৯-১৯৮৭)-এর কণ্ঠে একটি গানে দেশ গড়ার কথা আবার নতুন করে শোনা গেল।

“নীল আকাশের ওই কোলে
কান্না হাসির ঢেউ তুলে
...এ দেশ মোদের আয় গড়ি
আলোয় আকাশ আয় ভরি
প্রাণের বীণায় সুর ধরি সাধের সাধনায়।”[৭]

দেশ গড়ার কথা। তাঁর আরও একটি গানে সুবীর সেনের কণ্ঠে শুনি নতুন দিনের আহ্বান।

“ঐ উজ্জ্বল দিন, ডাকে স্বপ্ন রঙিন
ছুটে আয় রে লগন বয়ে যায় রে মিলন বিন,
ওই তো তুলেছে তান
শোনো ওই আহ্বান।”[৮]

ব্যক্তির এই সংকট বাংলা গানের কথায় আস্তে আস্তে জায়গা করে নিচ্ছে। আমরা দেখি ষাটের দশক আসতে আসতে অনেক বদল ঘটে যাচ্ছে বিশ্ব পরিস্থিতির। সেই পাল্টানোর সময়ে বাংলা গান নতুন মোড় নিচ্ছে। এই ষাটের দশকের গোটা বিশ্বের ইতিহাসকে একটু দেখে নেয়া যাক —

এ দশকের একেবারে শুরুতেই শোনা যাচ্ছে যুদ্ধের আওয়াজ, শোনা যাচ্ছে সারা বিশ্ব জুড়ে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে অভিযানের কথা। আর ঠিক সেই সময়ই প্রকাশিত হচ্ছে মিশেল ফুকো ১৯২৬-১৯৮৪)-র চিন্তাধারা। Madness and Civilization (১৯৬১), The Birth of the Clinic (১৯৬৩)-এর মতো বইগুলি আমাদের এতদিনকার ধারণাকে বদলে দিচ্ছে। তিনি বলছেন যে, আসলে মুক্তি বলে কিছু হয় না। একটি পরিস্থিতি থেকে আরেকটি পরিস্থিতিতে যাওয়াটাই হল সত্য। প্রতিটি পরিস্থিতিতেই থেকে যায় ক্ষমতা। আর, “Where there is power, there is resistance”[৯]। ষাটের দশকের প্রজন্ম এই বইগুলি পড়ছে। তার সঙ্গে তারা দেখছে ’৬৪-তে কমিউনিস্ট পার্টি ভাঙছে, ফ্রান্সের সরবন বিশ্ববিদ্যালয় উত্তাল হয়ে উঠছে ছাত্র আন্দোলনে, ভিয়েতনাম লড়াই দিচ্ছে বিরাট সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমেরিকার বিরুদ্ধে। এই সময়েই ইউরোপ এবং এশিয়ায় লক্ষ লক্ষ কমিউনিস্টকে হত্যা করা হচ্ছে। আবার এই ষাটের দশকেই কমিউনিস্ট দেশগুলি আরেক কমিউনিস্ট দেশকে আক্রমণ করছে। ’৬৮-তে মার্টিন লুথার কিং মানবতার পূজারীকে হত্যা করা হচ্ছে। ঘটনা বহুল এই ষাটের দশক। এ দশকে যাঁরা কৈশোর থেকে যৌবনের দিকে পা বাড়াচ্ছেন তাঁদেরই মধ্যে কয়েকজন নব্বইয়ের দশকে আমাদের যে গান শোনালেন তাঁদের গানে এ দশকের কথা শুনতে পাব এভাবে, -

“সঙ্গী ছিল আমার একটা গিটার ছেলেবেলায়
সঙ্গী একটা ইচ্ছে হলে হঠাৎ গান গেয়ে ফেলায়
...সঙ্গী ছিল ‘ব্লোয়িং ইন দ্য উইন্ড’ খনা খনা গলায়
সঙ্গী উত্তাল সরবন বড়ো হবার পালায়

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 108
Website: https://tirj.org.in, Page No. 959 - 970
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সঙ্গী হল সি.আর.পি.-র গুলির শব্দ রাত-দুপুরে
সঙ্গী নিষিদ্ধ বই লুকিয়ে রাখা আমার খাটের তলায়
সঙ্গী হল নাপাম বোমার ছবি সাদা কালো
সেই সঙ্গী নকশাল সঙ্গী যাকে পালিয়ে যেতে হল
বসন্তের মানে ছিল ঋতু হয়ে গেল মহামারী
সেই চুয়াত্তরের বসন্ততে পনেরো হাজার মরে গেল
সঙ্গী একটা ভয় আমার পাড়ায় দাঙ্গা লাগার পরে
সঙ্গী আটকে থাকা সেই ভয় নিয়ে বাড়ির ভেতরে।"[১০]

এই যে জীবনের কথা, এই প্রেক্ষিতগুলি ধীরে ধীরে সত্য হয়ে যাচ্ছে ষাটের দশক থেকে। যে দার্শনিক অবলোকনগুলির কথা বলা হল, তার পাশাপাশি আমরা সত্তরের দশকের গোড়াতেই পেয়ে যাচ্ছি গ্রামসি (১৮৯১-১৯৩৭)-কে। গ্রামসির রচনাগুলি এই সময় ইংরেজিতে অনূদিত হওয়া শুরু করল। আর তিনি দেখালেন যে, তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও তো 'সাবলটার্ন'-রা থাকে, শোষণ থাকে, হেজিমনি আর 'সাবলর্টান'-এর দ্বন্দ্ব থাকে। এই সত্তরের দশক থেকেই গুরুত্ব পাচ্ছে অনু ইতিহাস বা 'Micro History'। প্রতিটি অঞ্চল, প্রতিটি মানুষের প্রেক্ষিত, প্রতিটি অবস্থা যেখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে আর কোন বৈশ্বিক সত্য নেই, নেই কোনও বিশেষ মতবাদ, যেখানে এমন কিছু নেই যা আমাদের হাতে ধরে এগিয়ে দেবে, মুক্তির পথ নির্মাণ করে দেবে। তাই যুব উৎসবকে কেন্দ্র করে এসময়ের আর একজন অসম্ভব প্রতিভাবান গীতিকার জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১৭) লিখলেন এই গানটি —

"বন্ধু যদি আসো আগুন জ্বেলেই এসো
এখানে কিছু পোড়াতে হবে।
বন্ধু যদি আসো কিছু চৈত্র নিয়েই এসো
মিথ্যে ফাগুন ঝরাতে হবে।"[১১]

এই অস্থির মুহূর্তের কথাই বলে গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের মহীনের ঘোড়াগুলি।

"এই মুহূর্তে
তৃতীয় বিশ্ব জুড়ে মন্বন্তর বাড়ে এই মুহূর্তে,
খরা আর বন্যা শিশুদের কান্না এই মুহূর্তে,
জীবনধারণে গ্লানি শুধু মিছে হয়রানি এই মুহূর্তে,
বুকের গভীর ক্ষত ছড়িয়ে ইতস্ততঃ এই মুহূর্তে।"[১২]

লক্ষ করবেন বারবার এই মুহূর্তে কথাটি আসছে। আসলে, সময়টাকে ধরতে চাইছেন গীতিকার। আবার এই গানেই বর্তমান সময়ের বিপরীতে দাঁড়িয়ে অন্ততঃ কিছু একটা করার কথাও বলেন তিনি– 'এ বিশ্বরূপ দেখে চুপ করে থাকি যদি, আমি নেহাতই বেহায়া'। মহীনের ঘোড়াগুলির গৌতম চট্টোপাধ্যায়রা যে কথা বলতে চাইলেন তাঁদের গানে, সে গান আমাদের ষাটের দশকের কলকাতার কথা শুধু বলে না। বলে, গোটা বিশ্ব পরিস্থিতির কথা। প্রশ্ন তোলে করে প্রজন্মকে। খুঁজতে চায় অন্ধকারের থেকে মুক্তির উপায়, মুক্তির পথ। কিন্তু সেই ষাটের দশকের ধোঁয়াশায় মুক্তি তো অধরা। তবু, মহীনের ঘোড়াগুলি ডাক দিয়ে যায়।

"ওই দূরে ঝর্ণার পাড়ে
...ওগো আগুন মেয়ে তুমিও চল না সাথে আমার প্রিয় মন এসো অলস নীড় ফেলে
ওগো ফাগুন ছেলে নতুন পাতার দিনে ফিরে এসো এই গাঁয়ে দুখী দিন ফেলে

ওগো আগুন মেয়ে তুমিও চল না সাথে আমার প্রিয় মন এসো অলস নীড় ফেলে
ওগো ফাগুন ছেলে নতুন পাতার দিনে ফিরে এসো এই গাঁয়ে দুখী দিন ফেলে।"[১৩]

গৌতম চট্টোপাধ্যায়রা শুধু গানের কথাই নয়, গানের পরিবেশনেও একটা নতুন ভাষ্য রচনা করলেন। আমরা বলব আধুনিকতা থেকে উত্তরণের পথ তাঁরা নির্মাণ করলেন। বাংলা গানকে পৌঁছে দিলেন পরবর্তী স্তরে, যেখানে তাঁরা তাঁদের সহ-নাগরিকদের বিমূঢ়তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করলেন এইভাবে, -

"শুধু আজ নয় প্রতিদিন
সাত পাঁচ ভাবনা আর দুঃস্বপ্ন মেখে ঘুম ভাঙে আমার
তোমরা কেমন আছো?
তোমরা কি আমলকি গাছের ছায়ায় মোষের বিষণ্ণ ডাক শুনে
আনমনা হও আগেকার মতো?"[১৪]

এই যে মানবতার অসম্ভব অবক্ষয়ের সময়, সে সময় বাংলা গান কী করবে? কী করবেন বাংলা গীতিকাররা? তাঁরা তখন চাঁদ-তারা-পাখি নিয়ে মত্ত থাকতে পারেননি। মহীনের ঘোড়াগুলি যে দশকে গান-বাজনা করছে সেই সত্তরের দশক স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গের কাল। সমাজ বদলের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া ব্যক্তিসত্ত্বার ক্ষতবিক্ষত, বিপর্যস্ত অবস্থার ছবি তাই তাঁদের গানে।

"যে গেছে বনমাঝে চৈত্র বিকেলে
যে গেছে ছায়াপ্রাণ বনবীথিতলে,
যে গেছে ছায়াপ্রাণ বনবীথিতলে।

বন জানে অভিমানে গেছে সে অবহেলে
যে গেছে অশ্রুময়, বন-অন্তরালে
যে গেছে অশ্রুময়, বন-অন্তরালে।

আকাশে কেঁপেছে বাঁশিসুর
আঁচলে উড়েছে ময়ূর
চলে যাই, বলেছিলে চলে যাই
মহুল তরুর বাহু ছুঁয়ে
যে গেছে অশ্রুময়, বন-অন্তরালে

সে বুঝি শুয়ে আছে চৈত্রের হলুদ বিকেলে
সেখানে চূর্ণ ফুল ঝরে তার আঁচলে
সেখানে চূর্ণফুল ঝরে তার কাফনে।"[১৫]

এই যে স্বপ্ন, এটি বাংলা ভাষায়, বাংলা গানের একদম নতুন। এই স্বপ্ন যে প্রজন্মকে সৃষ্টি করল সেই প্রজন্মই পরবর্তীকালে নতুন রাজনীতির কথা নতুন ভাবে বলবার চেষ্টা করেছে। যার অন্যতম উদাহরণ আশির দশকের নগর ফিলোমেল নামক গানের দলটি। যাঁদের গানে পাই নাগরিক বিষণ্ণতার অন্য এক ছবি।

"পড়ন্ত আলোর ছটায় নেশা মন যেতে চায়
বিজনের চায়ের কেবিন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 108
Website: https://tirj.org.in, Page No. 959 - 970
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বসি গিয়ে জনা তিন, পায়াভাঙা উদাসীন
কয়েকটা চেয়ার টেবিল।

ধোঁয়া কালি রঙ চটা, একফালি দীর্ণতা
তবু যেন বিলাসিতা, রাজকীয় মত্ততা
গুঞ্জনে রাজ্যমুখর
আলোহীন চায়ের কেবিন।

কখনও বা দিন জুড়ে ব্যস্ত নগরে
ঝঞ্ঝাটে স্তব্ধ জীবন
পড়ে থাকে একা হায়, জনহীন দোকানে
বিষণ্ণ মালিক বিজন
বাকি প্রতি বিকেলে চামচে আওয়াজ তোলে
দেনাভারে শীর্ণ বিজন।

উষ্ণ চায়ের কাপে নেশাতুর রাত নামে
বয়ে চলে তরল জীবন
চলে এসো একদিন, দেখা হবে সেখানেই
বিজনের চায়ের কেবিন।"[১৬]

সত্তর পরবর্তী সময় ব্যক্তি মানুষের সংকট তীব্রতর হল। প্রাত্যহিক জীবনের স্বপ্নহীনতাকে আরও অমোঘ করে তুলল রাজনৈতিক বিপর্জয়। সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল বিশ্বায়নের পদধ্বনি। ধনতান্ত্রিক বিশ্বে মানুষ রূপান্তরিত হল পণ্যে। এ সময়েই আমরা শুনতে পেলাম একটি বলিষ্ঠ কণ্ঠ।

"দেখছি শহর তলিয়ে যাচ্ছে
নোংরা আমায় ভয় দেখাচ্ছে
সগ্রি এঁটোর পাহাড় কলকাতা।"[১৭]

নব্বইয়ের দশকে কবীর সুমনের আবির্ভাব কিন্তু নিছকই আকস্মিক নয়। আমরা চমকে গিয়েছি হয়ত। কারণ আমরা তো বাংলা গানের ইতিহাস চর্চায় তেমন উৎসাহী নই। এ দশকেই যখন বিশ্বায়ন আমাদেরকে ঘিরে ধরছে, আমাদের পাল্টে দিচ্ছে ধীরে ধীরে তখন তিনি লক্ষ করছেন এই কলকাতার মধ্যেই, -

"নাভির নীচে শাড়ি ইটের নীচে ঘাস
সংস্কৃতির নীচে পড়ে
নব বধূর লাশ।

এই কলকাতা তাঁর কাছে তার যাবতীয় অসম্পূর্ণতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তবুও সুমন বলেন, -

তিনশ বছর হাঁটলে তুমি
আমার গানের জন্মভূমি
গান ধরেছি তোমার নামে কলকাতা।"[১৮]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 108
Website: https://tirj.org.in, Page No. 959 - 970
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সেই কলকাতাতেই সত্তর দশকের প্রথমদিকের কোনও এক সকালে রেওয়াজ করে বাইরে এসে হঠাৎ করে আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর বাড়ির পাশের নালায় ভেসে চলা ছুরিবিদ্ধ একটি লাশ। কবীর সুমনের হাতে বাংলা গানের আর এক পর্বান্তর—ভাষা ও ভাবের সমন্বয়ে তিনি যে সংগীত নির্মাণ করেন তাতে যেমন মূর্ত করে তোলেন তাঁর সময়ের সত্যকে তেমনই তাঁর উত্তর প্রজন্মের চিন্তায় বুনে দেন কিছু শাশ্বত স্বপ্ন। যেখানে একজন কবি শিল্পী তাঁর পরিস্থিতির বিপরীতে একক লড়াই লড়ে যান এবং সেই অসম লড়াইয়ে জয়ী হবার বিশ্বাস রাখেন। কবীর সুমনের গানের ভাষায় উত্তরাধুনিক প্রজন্মের ব্যক্তি মানুষের টুকরো টুকরো আশা উঁকি দিয়ে যায়। গানের কাছে তাঁর প্রত্যাশা, -

“গান তুমি হও গরম কালের সন্ধে বেলার হাওয়া
অনেক পুড়ে যাওয়ার পরে খানিক বেঁচে যাওয়া।
গান তুমি হও বিশ্রী গরম ভুলিয়ে দেয়া বৃষ্টি
সজীবতার ভরসা দেয়া সফল অনাসৃষ্টি।”[১৯]

একবিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তির নিজস্ব প্রেক্ষিতগুলিকে প্রাধান্য দিয়েই গান তৈরি হবে। একথা কবীর সুমনের বুঝতে অসুবিধা হয়নি। যেমন হয়নি তাঁর প্রজন্মেরই আর একজন গীতিকার, গায়ক অঞ্জন দত্তের। কলকাতার নাগরিক মধ্যবিত্ত প্রেক্ষাপটে রচিত তাঁর গানগুলিতেও প্রধান হয়ে ওঠে সেই ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ। ছোট্ট জানলায় ধরা দেয় গোটা পৃথিবী।

“সেই পৃথিবীতে বাঁচব বলেই যুদ্ধ করি রোজ।
একটুখানি বাঁচার জন্য হাজার আপোষ।
সেই পৃথিবীর নাম কলকাতা কি ভারত জানি না,
তুমি তোমার পৃথিবীর নামটা জানো কি?
তুমি বলবে আমার বেনিয়াপুঁকুর, তোমার বেহালা।
তুমি গন্ডি কেটে দেখিয়ে দেবে পশ্চিম বাংলা।
হয়ত কেরালার আকাশ আরেকটু বেশি নীল,
তবু সেটাও কি নয় আমার পৃথিবী?

আমার জানলা দিয়ে যায় না দেখা ইসলামবাদ।
শুধু দেখি আমি রোজ আমার পাশের বাড়ির ছাদ।
একটা হলদে শাড়ি শুকোচ্ছে আজ মোজার রংটা নীল,
আজ পৃথিবীটা বড্ডোই রঙিন।”[২০]

কলকাতার পড়ন্ত বিকেলে ফুটপাথের কলের জলে স্নানরত একটি কিশোর হয়ে ওঠে অঞ্জন দত্তের গানের বিষয়। এমন অনেক সাধারণ বা অতি সাধারণ ব্যক্তি, বিষয় তাঁর কাছে গুরুত্ব পায় যা থেকে আমরা বুঝতে পারি তাঁদের মতন শিল্পীরা আসলে খুঁজতে চান সত্যের ভিন্নতর ব্যাখ্যা। সাধারণভাবে মুরগি কথাটার সাথে সংযুক্ত হয়ে আছে খাবারের প্রসঙ্গ। বহু মানুষের খাদ্য তালিকার অপরিহার্য একটি উপাদান এটি। কিন্তু দশ বছরের একটি শিশু যাকে এই সমাজ বাধ্য করেছে কোনও এক মাংসের দোকানে মুরগির পালক ছাড়াবার পেশা বেছে নিতে, তার কাছে ‘আটতিরিশটা পাখি মানে ন টাকা পঞ্চাশ’। কেননা, ‘চারটে মুরগি ছাড়লে একটা টাকার নোট’।[২১] কারও কাছে হয়ত লড়াই, প্রতিবাদ এই সমস্ত কিছুই চরম সত্য। কিন্তু অঞ্জন বলেন, -

“সুদিন আসবে বলে মোরা আগুন জ্বালাই,
আর হাজার হাজার মানুষ মরে যায়।”[২২]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 108
Website: https://tirj.org.in, Page No. 959 - 970
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাংলা গানের আধুনিকতার পরবর্তী পর্যায়টি এখনও বহমান। এই পর্বে গানের বাণী কীভাবে সময়ের সত্যকে উপস্থাপিত করবে তার নানান পরীক্ষা চলেছে। বহু গীতিকার তাঁদের মতো করে বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন আজও। কিন্তু, চিরাচরিত আধুনিক ধারণাগুলি যখন একের পর এক ভেঙে পড়ে, যখন সত্য হয়ে ওঠে বহুমাত্রিক, তখন অর্থাৎ উত্তরাধুনিক সময়ে বাংলা গানকে খুঁজে পেতেই হবে সমকালের বাণী। নির্মান করতে হবে এক ভিন্নতর ভাষ্য।

Reference:

১. পৃথিবী আমারে চায়। কথা – মোহিনী চৌধুরী, সুর – কমল দাশগুপ্ত
https://youtu.be/2rfV4HNsizE?si=7bFJDvDjspA2gYXi
২. চৌধুরী, সবিতা, অন্তরা চৌধুরী, রণবীর নিয়োগী (সং. ও সম্পা.), ‘সলিল চৌধুরী রচনা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড’, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, পৃ. ৯০-৯১
৩. সেন, অরুণ, গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), ‘চার দশকের বাংলা গান’, কলকাতা, প্রকাশ ভারতী, মে ১৯৬০, পৃ. ১৮৯
৪. নন্দী, সুব্রত (সম্পা.), ‘গণসংগীত সংগ্রহ’, কলকাতা, নাথ পাবলিশিং, নভেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১৫৩
৫. সেন, অরুণ, গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬-২০৭
৬. বোধ, জীবনানন্দ দাশ, *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা,* কলকাতা, নাভানা, ১৯৫৪, পৃ. ২০
৭. সুধীন দাশগুপ্ত, নীল আকাশের ওই কোলে।
https://www.milansagar.com/kobi/sudhin_dasgupta/kobi-sudhindasgupta_kobita3.html
৮. সুবীর সেন, ওই উজ্জ্বল দিন। https://youtu.be/KqWOHLzPys0?si=wqVqMOhc2si42lR9
৯. Foucault, Michel, The History of Sexuality, Volume I: An Introduction, Tr. Robert Hurley, Pantheon Books, New York, P. 95
১০. অঞ্জন দত্ত, সঙ্গী। https://youtu.be/JQTEaqKJivM?si=Fe-j_y02s8GhbKAE
১১. জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, বন্ধু যদি আসো। https://youtu.be/shxDuHeU3CA?si=iyu9yitre0tLtjxt
১২. গান - এই মূহুর্তে কথা ও সুর : গৌতম চট্টোপাধ্যায়,
https://youtu.be/wQ6LkkoR46c?si=0UMFcKsZbRyitYQ6
১৩. ওই দূরে ঝর্ণার পাড়ে https://youtu.be/bgTAJBUyReE?si=fiovpYz_TqZk2NmN
১৪. শুধু আজ নয় প্রতিদিন https://youtu.be/a1Yf6t47VFo?si=o4uys0Ono9AYb4Qg
১৫. যে গেছে বনমাঝে চৈত্র বিকেলে https://youtu.be/XbBtIx6V8FI?si=oZElth7iD2ysjALH
১৬. বিজনের চায়ের কেবিন https://youtu.be/qAidGOqV2NM?si=HYQdA1ZsTo3Ilu6X
১৭. https://youtu.be/w-8UXaF4rjA?si=3A2duhlBRuY6ng1b
১৮. তিন শতকের শহর কবীর সুমন - https://youtu.be/oLUv_G7QZ_8?si=ozTGS4FHvQHNewAW
১৯. গান তুমি হও — কবীর সুমন https://youtu.be/gG2kyO1wTYg?si=G3JigAz-gKxXcKQ5
২০. আমার জানলা দিয়ে — অঞ্জন দত্ত https://youtu.be/FUIhZEI0ANo?si=SKx4UWidMNbwa0Oj
২১. আলিবাবা — অঞ্জন দত্ত https://youtu.be/1ijPgW_f2yk?si=E6odTx_F5W4OEEfa
২২. তুমি আসবে বলে — অঞ্জন দত্ত https://youtu.be/ROecNzXof6Q?si=7ODl-OoE89Qv9y9N

Bibliography:

অরুণ সেন, গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), ‘চার দশকের বাংলা গান’, কলকাতা, প্রকাশ ভারতী, মে ১৯৬০
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘সংগীতচিন্তা’, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, অগ্রহায়ণ ১৩৯৯
রাজ্যেশ্বর মিত্র, ‘বাংলার গীতিকার’, কলকাতা, মিত্রালয়, ১৩৬৩

সবিতা চৌধুরী, অন্তরা চৌধুরী, রণবীর নিয়োগী (সং. ও সম্পা.), ‘সলিল চৌধুরী রচনা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড’, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং

সুধীর চক্রবর্তী, ‘গান হতে গানে’, কলকাতা, পত্রলেখা, জানুয়ারি ২০০০

সুব্রত নন্দী (সম্পা.), ‘গণসংগীত সংগ্রহ’, কলকাতা, নাথ পাবলিশিং, নভেম্বর ১৯৯০